দ্বিতীয় সংস্করণ

চা শ্রমিকের কথা

সম্পাদক ও মুখ্য গবেষক

ফিলিপ গাইন

চা শ্রমিকের কথা

চা শ্রমিকের কথা

সম্পাদক ও মুখ্য গবেষক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা ও গবেষণা সহকারী
**রবিউল্লাহ, খাদিজা খানম,
আলিমুল হক, রামভজন কৈরী,
লুসিল সরকার**

যাঁরা লিখেছেন
নির্মলেন্দু ধর, ড. প্রতিমা পাল-মজুমদার, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজুর রহমান সরকার, ড. নওয়াজেশ আহমেদ, তপন দত্ত, ফিলিপ গাইন, রবিউল্লাহ, জেমস সুজিত মালো, খাদিজা খানম, পার্থ শঙ্কর সাহা, আলিমুল হক, এডভোকেট একেএম নাসিম, এফএমএ সালাম, শেখর কান্তি রায়, মেহেদী আল আমীন এবং এএসএম সফরুল ইসলাম।

প্রকাশক

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১৪৭/১ গ্রীন রোড (৩য় তলা), ফ্ল্যাট নং ২এ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬ ই-মেইল: philip.gain@gmail.com;
sehd@sehd.org. ওয়েব পেজ: www.sehd.org

প্রথম সংস্করণ: ২০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০২২

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি: ফিলিপ গাইন

কম্পোজ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: প্রসাদ সরকার

স্বত্ব: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

এ বই-এর প্রথম সংস্করণ ছাপাতে অস্ট্রেলীয় সরকার সহায়তা দিয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে মিজেরিওর ও ইকো কো-অপারেশন। এ বইয়ে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা লেখকদের নিজেদের এবং আবশ্যিকভাবে অস্ট্রেলীয় সরকার, মিজেরিওর ও ইকো কো-অপারেশন-এর নয়।

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৫২-১৯-১

ISBN: 978-984-8952-19-1

মুদ্রক: জাহান ট্রেডার্স

মূল্য: ৪০০ টাকা, US$ 15

Cha Sramiker Katha (The Story of Tea Workers) is edited by Philip Gain and published by Society for Environment and Human Development (SEHD). *Cha Sramiker Katha* is a book on the tea plantation workers and the tea industry in Bangladesh.

সূচি

ভূমিকা vii

কৃতজ্ঞতা xiii

বাংলাদেশের চা ও চা-শ্রমিক—*ফিলিপ গাইন* ১

চট্টগ্রাম অকশন হাউজ—*খাদিজা খানম ও এএসএম সফরুল ইসলাম* ৬

স্বাস্থ্যহানিকর অ্যাজবেসটসের ঘরে চা শ্রমিকদের বসবাস, বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি—*মেহেদী আল আমীন* ২৮

নারী চা শ্রমিক কুমারী মৃধার জীবনকাহিনী ৪৬

পঞ্চগড় ও অন্যান্য এলাকায় অর্গানিক ও ক্ষুদ্রায়তনে চা চাষ
—*ফিলিপ গাইন, এএসএম সফরুল ইসলাম ও রবিউল্লাহ* ৪৯

চা শ্রমিকের আবাসন ও স্বাস্থ্য—*এফএমএ সালাম* ৬৩

একজন কীটনাশক ছিটানো শ্রমিকের কথা—*এফএমএ সালাম* ৬৮

চা জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার
—*ফিলিপ গাইন ও জেমস সুজিত মালো* ৭৩

গর্ভবতী বাগান মায়ের উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যতথ্য ৮৮

চা বাগানের প্রত্যন্ত লেবার লাইনের এক দরিদ্র মায়ের গর্ভপাত হলো যেভাবে ৮৯

এক গর্ভবতী চা শ্রমিকের কথা ৯১

মৃত্যুর হাত থেকে নবজাতককে বাঁচিয়ে ফেরা এক মা ৯৩

চা বাগানের শিক্ষাচিত্র—*পার্থ শঙ্কর সাহা* ৯৭

মারিস্ট ব্রাদারদের 'অসম্ভব স্কুল' ১০৮

সারদা গোয়ালাঃ চা বাগানের প্রথম নারী গ্রাজুয়েট ১১১

চা শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম
—*ফিলিপ গাইন, রবিউল্লাহ, শেখর কান্তি রায় এবং এফএমএ সালাম* ১১৫

বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন—*তপন দত্ত* ১২৯

ক্ষেতল্যান্ড ও চা শ্রমিক শংকু মাঝির লড়াই—*শেখর কান্তি রায়* ১৩৯

পাত্তিওয়ালি ধনতি রবিদাসের জীবন—*এফএমএ সালাম* ১৪৩

নাম তার ক্যামেলিয়া—*ড. নওয়াজেশ আহমদ* ১৪৭

সবুজ চা—*ড. নওয়াজেশ আহমদ* ১৫৫

বাংলাদেশের চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের শোভন কর্ম অর্জনের ব্যাপ্তি ১৫৯
—প্রতিমা পাল-মজুমদার ও মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজুর রহমান সরকার

আশা অরনাল: হার না মানা একজন চা শ্রমিক ১৯৬
—সাবরিনা মিতি গাইন

চা-শ্রমিক সংশ্লিষ্ট আইন—*নির্মলেন্দু ধর* ২০১

শ্রম আইনে চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ২৩১
—এডভোকেট একেএম নাসিম

চা ও চা শ্রমিকদের নিয়ে নির্বাচিত প্রকাশনা ২৩৫
—পর্যালোচনা ও সংকলন: খাদিজা খানম, আলিমুল হক ও ফিলিপ গাইন

চা শিল্প ও চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ওয়েব উৎসসমূহ ১৫৮
—পর্যালোচনা ও সংকলন: খাদিজা খানম, আলিমুল হক ও ফিলিপ গাইন

সংযোজনী-ক: শ্রম চুক্তির স্মারকপত্র ২৭৫
মালিক পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন বাংলাদেশীয় চা সংসদ (বিসিএস), ঢাকায় যাহার রেজিষ্টার্ড অফিস রহিয়াছে। (১ জানুয়ারি ২০১৯ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০)

সংযোজনী-খ: ১লা জানুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে কার্যকর ২৯৯
করার লক্ষ্যে বাংলাদেশীয় চা সংসদের কাছে পেশকৃত বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের ২০ দফা দাবিনামা। (১ জানুয়ারি ২০২১ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২)

সংযোজনী-গ: প্রয়োজনীয় কিছু ঠিকানা ৩১১

সংযোজনী-ঘ: চা বাগানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৩১৮
—সংকলন ও অনুবাদ: ফিলিপ গাইন, রবিউল্লাহ ও প্রসাদ সরকার

সংযোজনী-ঙ: চা শ্রমিকের অধিকার বিষয়ে নাগরিক ঘোষণা ও সুপারিশমালা ৪০০

সংযোজনী-চ: চা, চা শিল্প, চা বাগান এবং চা শ্রমিক সংক্রান্ত পরিভাষা ৪১০

সংযোজনী-ছ: চা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৮ নং আইন) ৪২৩

ভূমিকা

এ বই মূলত বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের নিয়ে। তবে যে অবস্থার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা চা শ্রমিকরা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন তা বোঝার জন্য এখনকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডে চা-চাষের উৎপত্তি, বিকাশ, মালিকানা, চা চাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ব্যাবহার, চায়ের ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে নানা তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে এ বই-এ।

ভারতের আসামে চা চাষ শুরু হয়েছিল ১৮৩৯ সালে। আর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে চা বাগান স্থাপন করা হয় ১৮৪০ সালে। তবে এদেশে ১৮৫৪ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভিত্তিতে চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর এ অঞ্চলের চা-শিল্পকে প্রভাবিত করেছে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এরমধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা: ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তি, ১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধ ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জন। ঐতিহাসিক এসব ঘটনার কারণে ব্রিটিশরা বনভূমি ও সরকারি জমিতে যেসব চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করে সেসবের মালিকানা বদল হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে চা-বাগান আছে সর্বমোট ১৬৬টি (সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার ৮টি সহ)। এদেশের চা-শিল্পের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, চা চাষের জন্য ১৫৮টি চা-বাগানকে (পঞ্চগড়ের ৭টি ও ঠাকুরগায়ের ১টি বাগান বাদে) বরাদ্দ দেয়া সকল জমির (সর্বমোট ১ লাখ ১৩ হাজার ১১৬ দশমিক ৪৪ হেক্টর) মালিক রাষ্ট্র (বাংলাদেশীয় চা সংসদের ২০১৮ সালের হিসাব)। বাংলাদেশের চা-বাগানগুলো আয়তনে বিশাল এবং এসবের মালিকরা এগুলো পরিচালনা করেন ব্রিটিশ আমলের 'সাহেব' ও 'জমিদারদের' মতো করে। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বরাদ্দকৃত জমির ৫২.৯৮% চা চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে (২০১৮ সালের হিসাব)।

অনেকে মনে করেন চা চাষের জন্য বরাদ্দকৃত জমি অন্য কোনো বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা অনৈতিক এবং চা-শ্রমিকদের ওপর চলমান সামাজিক অবিচারে উৎসাহ যোগায়।

ভারত বিভক্তির পর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) যতো চা উৎপন্ন হতো তার সিংহভাগই চলে যেতো পাকিস্তানে (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান)। স্বাধীনতার পর, পাকিস্তানই বাংলাদেশের চায়ের সবচে বড় আমদানিকারক হিসেবে ছিল অনেক বছর। অবশ্য বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের সামান্যই রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে (২০১০ সাল থেকে) চা আমদানি করছে। ২০২২ সালে এসে ১৬৯ বছরে বাংলাদেশে চায়ের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে (বণিক বার্তা, ২২ জানুয়ারি ২০২২)।

এটি ভালো খবর হলেও চা এখন আর বাংলাদেশর উল্লেখযোগ্য কোনো রপ্তানি পণ্য থাকছে না। তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চায়ের বাজার চাঙ্গা। ফলে আমাদের যদি চা খুব একটা রপ্তানি করতে নাও হয় তবুও সেটা ভালো খবর।

চা, এর উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য নিয়ে আলোচনায়, চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের বিষয় খুব একটা গুরুত্ব পায় না; এদের সুখ-দুঃখের খোঁজ নেয়া হয় খুবই কম। চা-শিল্প অন্যান্য শিল্পের মতো নয়। চা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কৃষি ও শিল্প জড়িত। তবে অধিকাংশ শ্রমিকই চা-বাগানে বা মাঠের কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই শ্রমিকদের অধিকাংশ বাঙালি নন। দেড়শো বছরেরও আগে থেকে বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর প্রদেশসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো দালালদের মাধ্যমে এই শ্রমিকদের নিয়ে এসেছিল সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানগুলোতে কাজ করার জন্য। চা-বাগানগুলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর পর থেকেই এদের দুর্ভাগ্যের শুরু। এক বর্ণনা অনুসারে, শুরুর কয়েক বছরেই ক্লান্তিকর লম্বা ভ্রমণ এবং কঠিন কাজ ও খারাপ কর্মপরিবেশের কারণে শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়। চা-বাগানে আসার পর শ্রমিকদের নতুন পরিচয় হয় 'কুলি' হিসেবে এবং এরা চা-কোম্পানিগুলোর সম্পত্তিতে পরিণত হন। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এই 'কুলি'রা জঙ্গল পরিষ্কার করেন, চায়ের চারা উৎপন্ন করেন, চারাগাছ ও ছায়াবৃক্ষ রোপণ করেন এবং চা-বাগানের মালিকদের জন্য বিলাসবহুল বাংলো নির্মাণ করেন। কিন্তু তাদের নিজেদের জীবন আটকে যায় লেবার লাইনের কুঁড়ে ঘরে, যে ঘর তারা নিজেরাই নির্মাণ করেন।

চা শ্রমিকরা যখন প্রথম এখানে আসেন, তখন তারা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চার বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সে থেকেই শুরু তাদের দাসত্বের জীবন। ইতিমধ্যে দেড়শো বছরের বেশি বা চার প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। চা শ্রমিকদের জীবনচক্র লেবার লাইনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তাদের বাচাঁর বিকল্প কোনো পথ নেই; যে ঘরে তারা বাস করেন এবং যে জমি তারা চাষ করেন তার ওপর কোনো মালিকানা নেই তাদের। তারা নগদ মজুরি পান খুব কম; পান কিছু প্রান্তিক সুবিধা। লেবার লাইনের ঘর তেমনি একটি সুবিধা। চা-বাগানের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমিতে নির্মিত লেবার লাইনে প্রত্যেক স্থায়ী চা-শ্রমিকের জন্য একটি করে ঘর দেয় বাগানের মালিক। এগুলো মেরামতের দায়িত্বও বাগান ব্যবস্থাপনার। তবে বাস্তবে প্রায় ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নিজেরাই ঘরগুলো মেরামতের কাজ করেন। লেবার লাইনের ঘরগুলোতে বসবাসের অবস্থা সাধারণভাবে অসন্তোষজনক এবং কখনো কখনো খুবই খারাপ। সাধারণত লেবার লাইনের একটি ঘরে একটি পরিবারের বিভিন্ন বয়সের বেশ কয়েকজন সদস্যকে বাস করতে হয়। কখনো কখনো দেখা যায় একই

ঘরে মানুষের সাথে বাস করছে গবাদিপশুও। কোনো কোনো শ্রমিক পরিবার নিজেদের উদ্যোগে একটি অতিরিক্ত ঘর বানানোর চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে তাদের নিতে হয় বাগান ব্যবস্থাপনার আগাম অনুমতি। এবং সে অনুমতি খুব সহজে মেলে না।

চা শ্রমিকরা দৈনিক বা মাসিক ভিত্তিতে যে মজুরি পান তা খুবই নগন্য। ২০০৮ সালেও দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত একজন চা শ্রমিকের সর্বোচ্চ দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র ৩২ টাকা ৫০ পয়সা (আধা মার্কিন ডলারেরও কম)। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে চা শ্রমিকদের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ড চা শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করে 'এ' ক্লাস বাগানের জন্য ৪৮ টাকা, 'বি' ক্লাস বাগানের জন্য ৪৬ টাকা এবং 'সি' ক্লাস বাগানের জন্য ৪৫ টাকা। বর্ধিত মজুরি শ্রমিকদের মনে খানিকটা স্বস্তি আনে বটে তবে এ মজুরিও যথেষ্ট ছিল না।

২০১৪ সালের ১০ আগস্ট গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের পর বাংলাদেশীয় চা সংসদের সাথে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের যে চুক্তি হয় তাতে চা শ্রমিকের দৈনিক নগদ মজুরি দাড়ায় 'এ' ক্লাস বাগানের জন্য ৮৫ টাকা 'বি' ক্লাস বাগানের জন্য ৮৩ টাকা এবং 'সি' ক্লাস বাগানের জন্য ৮২ টাকা। এ বেতন কাঠামো ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ২৪ জুন। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের বিজয়ী প্যানেলের সাথে বাংলাদেশীয় চা সংসদের সর্বশেষ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি মাস থেকে দুই বছরের জন্য কার্যকর চুক্তিপত্র অনুসারে চা শ্রমিকদের মজুরি 'এ' ক্লাস বাগানের জন্য ১২০ টাকা, 'বি' ক্লাস বাগানের জন্য ১১৮ টাকা এবং 'সি' ক্লাস বাগানের জন্য ১১৭ টাকা।

দৈনিক নগদ মজুরির পাশাপাশি লেবার লাইনে একটি ঘর ছাড়াও, প্রান্তিক সুবিধা হিসেবে চা শ্রমিকরা আরো কিছু সুবিধা পান, যেমন: ভাতা, হাজিরা উৎসাহ বোনাস, হ্রাসকৃত মূল্যে রেশন, ফসল উৎপাদনের জন্য ক্ষেতল্যান্ড ব্যবহারের সুযোগ (যে শ্রমিক এ সুযোগ গ্রহণ করে, তার রেশন আনুপাতিক হারে কেটে নেয়া হয়), চিকিৎসা সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ইত্যাদি। দৈনিক মজুরি এবং অন্যান্য সুবিধা যা তারা পান সেসব যোগ করলে তাদের মোট দৈনিক প্রাপ্তি ২০২০ সালে এসে ২০০ টাকারও কম এমন দাবি বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও অন্যান্য অনেকের।

এর মধ্যে ২০১৯ সালের শেষার্ধে চা শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের জন্য তৃতীয়বারের মতো নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করে সরকার। মজুরি বোর্ডে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের প্রতিনিধি আছে। মজুরি বোর্ডে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি রামভজন কৈরী জানিয়েছেন নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কাছে তারা দৈনিক নগদ মজুরি দাবি করছেন ৩০০

টাকা। বাংলাদেশ চা শ্রমিকের পাশাপাশি অন্য কিছু পক্ষও তাদের সুপারিশ পাঠিয়েছে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কাছে। মালিক পক্ষ বলছে চায়ের দাম পড়ে গেছে। কাজেই মজুরি বাড়াবার সুযোগ নেই। শ্রমিকদেরকে চরমভাবে হতাশ করে মজুরি বোর্ড ২০২১ সালের জুন মাসে শ্রম মন্ত্রণালয়ে যে সুপারিশ পাঠায় তাতে শ্রমিকদের মজুরি এক টাকাও না বাড়িয়ে ১২০ টাকাই রাখা হয়। বরং শ্রমিকরা এতোদিন ধরে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছেন তা কমানোর সুপারিশ করে মজুরি বোর্ড। নিম্নতম মজুরি বোর্ডের প্রস্তাবিত মজুরি কাঠামো বিশ্লেষণ করে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) জাতীয় সংবাদপত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সংলাপের আয়োজন করে যাতে শ্রম মন্ত্রণালয়ে সচিবসহ অনেকে অংশ নেন। কিছুটা আশার কথা হলো শ্রম মন্ত্রণালয় শ্রম আইন অনুসরণ করে মজুরি বোর্ডের প্রস্তাবিত মজুরি কাঠামো পুনঃবিবেচনার জন্য ফেরত পাঠায়। এরপরও মজুরি বোর্ড তার সুপারিশে কোনোরকম পরিবর্তন না আনায় ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর স্বয়ং শ্রম প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে চা শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে এ সভায় কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মজুরি বোর্ডেকে। এরপরও মজুরি না বাড়ানোর ব্যাপারে শক্ত অবস্থানে থাকা মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সুলতান মাহমুদ (সিনিয়র জেলা জজ) অবসরে যাওয়ায় আজো (জুন ২০২২) মজুরি বোর্ড চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। জানা গেছে মজুরি বোর্ডে নতুন চেয়ারম্যান যোগ দেবার পর এখনো (জুন ২০২২) কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পরিস্থিতি চা শ্রমিকদের জন্য চরম হতাশাজনক। কারণ তারা বর্তমানে যে মজুরি পাচ্ছে তা ২০২০ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর। ২০২১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে তাদের মজুরি বাড়ার কথা। একদিকে মজুরি বোর্ড নিয়ে অচলাবস্থা অন্যদিকে মালিক-শ্রমিক পক্ষের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বিলম্ব। শ্রমিকরা মজুরি নিয়ে এ অচলাবস্থার অবসান চান।

ভারত ও শ্রীলংকার চা শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করলে, বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা অনেক কম মজুরি পান যদিও আমাদের প্রতিবেশি এ দুই দেশের চা-শ্রমিকরা তাদের মজুরি আরো বাড়াবার দাবি জানাচ্ছেন বরাবর। অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের মজুরি এতো কম হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই; তারা আরো বেশি মজুরি পাওয়ার যোগ্য।

চা শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা পাতা তুলতে গিয়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন প্রখর রোদে পুড়ে অথবা বৃষ্টিতে ভিজে। অবসর নেয়ার আগে, একজন চা পাতা তোলা নারী শ্রমিক

৩০ থেকে ৩৫ বছর পার করেন স্রেফ দাঁড়িয়ে কাজ করে। চা পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা (যাদের অধিকাংশই নারী) সাধারণত সোমবার থেকে শনিবার প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা (মাঝখানে দুপুরের খাবারের সময় বাদ দিলে ৭ থেকে ৮ ঘন্টা) পর্যন্ত কাজ করেন। রোববার সাপ্তাহিক ছুটির দিন (কিছু বাগানে ছুটি শুক্রবার)। চা শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষদের কাজের সময় সীমিত হলেও মহিলারা চা পাতা তোলার নিরিখ পূরণ করার পর নিয়মিতভাবে নিরিখের সমান বা তারও বেশি পাতা তোলেন বাড়তি আয়ের জন্য। নারী শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ কারানোর এ এক অভিনব কৌশল।

একটি জনসমষ্টি বা সমাজের উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ সোপান হচ্ছে শিক্ষা। চা-জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার একটি কারণ শিক্ষায় পশ্চাদপদতা। চা-বাগানগুলোতে স্কুল আছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের ২০০৪ সালের হিসাব অনুসারে, ১৫৬টি চা বাগানে (পঞ্চগড় বাদে) ১৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ৩৬৬ জন ও শিক্ষার্থী ২৫,৯৬৬ জন। চা-বাগানগুলোতে সরকারি স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। বাংলাদেশ টি বোর্ডের ২০১৪ সালের হিসাব বলছে চা বাগানগুলোতে স্কুলের সংখ্যা ১,০৫৪। এসব স্কুলে শিক্ষক ৬৭৮ এবং ছাত্রছাত্রী ৩৫,৫৬২। এসময় ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও ও মিশনারিদের অনেক স্কুল চালু ছিল। বাংলাদেশ টি বোর্ডের ২০০৪ এবং ২০১৪ সালের হিসাব দেখে মনে হচ্ছে এসময় হিসাবে বেসরকারি স্কুলসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এসময়ের মধ্যে বিশেষ করে শ্রীমঙ্গলে বেশ কিছু সরকারি স্কুলও যোগ হয়েছে।

চা-জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাংলাদেশের সবচে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষগুলোর অন্যতম। তাদের শুধু সমানাধিকার দেয়াই যথেষ্ট নয়, তারা রাষ্ট্রের বিশেষ মনোযোগ পাবার দাবিদার। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরা আগের মতোই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, কম মজুরিপ্রাপ্ত, শিক্ষায় পশ্চাদপদ ও বঞ্চিত। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিক্ষা, জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর কেউ কেউ এই চা শ্রমিকদের মনে করেন অস্পৃশ্য। চা-বাগানের লেবার লাইনে তারা এমনভাবে আটকে গেছেন যে মনে হয় তারা মূল বাংলাদেশ ও বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। তারা হারিয়েছেন তাদের মর্যাদা। এ অবস্থা চা-শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের শোষণ করার মোক্ষম সুযোগ করে দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো: এই হতভাগ্য চা-শ্রমিকরা আর কতকাল লেবার লাইনে বন্দী হয়ে থাকবেন? চার-পাঁচ প্রজন্ম ধরে যে ভূমিতে তারা বাস করছেন, সে ভূমিতে কি তাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না? চা-বাগান মালিকরা চান বর্তমান অবস্থা

বজায় থাকুক; কারণ এতে সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার দীর্ঘকালের ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু চা-জনগোষ্ঠী এখন আগের চেয়ে খানিকটা হলেও সচেতন; তারা ন্যায়বিচার চান। চা শ্রমিকরা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছ থেকে শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি ও স্যানিটেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন সেবা চান। তারা চান, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি পরিচয়ের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে চা শ্রমিকরা দেশের যে কোনো জায়গায় বসবাস করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, চা জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষই কোনোদিন চা-বাগানের বাইরে পা রাখেননি। চা-বাগানের সঙ্গে এক অদৃশ্য শেকলে বাঁধা তাদের জীবন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অধিকারহীনতা এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও বাঙালি প্রতিবেশীদের বিরূপ আচরণ তাদের পরিণত করেছে বাঁধা শ্রমিকে।

চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বুঝতে এবং চা শিল্প কীভাবে পরিচালিত হয় তা জানতে আগ্রহী মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী, শ্রমিক সংগঠন, গবেষক, চা জনগোষ্ঠীর মানুষ ও যেকোনো পাঠকের জন্য এ গ্রন্থ, *চা শ্রমিকের কথা*। চা শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণ এবং মতামত ছাড়াও এ গ্রন্থে আছে চা শিল্প ও চা-শ্রমিকদের নিয়ে লেখা গুরুত্বপূর্ণ বইপত্রের পর্যালোচনা, ইন্টারনেটের ব্যবহার নিয়ে পরামর্শ, চা ও চা শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করেন এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা, চা শিল্প ও চা শ্রমিকদের নিয়ে নির্বাচিত পরিভাষা, দেশের সমস্ত চা-বাগানের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের নিয়ে এ গ্রন্থ এমন একটা সময়ে প্রকাশিত হলো যখন সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার এবং দরিদ্র, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। চা শ্রমিকরা শুধু দরিদ্রই নন, তারা চরমভাবে বঞ্চিত একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ তাদের নেই বললেই চলে। চা-বাগানের বাইরে বিকল্প জীবিকার সন্ধান করাও তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমরা আশা করি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ চা শ্রমিকদের বিষয়সমূহ গুরুত্বসহকারে দেখবে এবং রাজনৈতিক ও মানবিক সুরক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করবে।

এ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। প্রথম প্রকাশের বারো বছর পর আরো অনুসন্ধান, গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করে প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় সংস্করণ।

ফিলিপ গাইন
সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা

চা শিল্প এবং চা-শ্রমিকের অবস্থা যখন আমরা বোঝার জন্য চা-বাগানগুলোতে ঘোরাঘুরি শুরু করি তখনই টের পাই চা বাগানে বাইরের মানুষ এখানে অনাহূত! চ-শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থা এবং এ শিল্পের উপর মৌলিক তথ্য-উপাত্ত যোগাড় করা বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জন্য। তবে অনেক ব্যক্তি, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন আমাদেরকে চা-বাগান ও লেবার লাইনের ভেতর অবাধে প্রবেশ এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে অনেক সাহায্য করেছে।

যেসব ব্যক্তি সেড-এর গবেষণা দলকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে যাদের নাম কৃতজ্ঞার সাথে উল্লেখ করতে চাই তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামভজন কৈরী, তপন দত্ত, বিজয় হাজরা, নৃপেন পাল, অপূর্ব নারায়ন, বিজয় বুনার্জি, পরিমল সিংহ বারাইক, রাজেন্দ্র প্রসাদ বুনার্জি, জিডিশন প্রধান সুচিয়াং, পিডিশন প্রধান সুচিয়াং, ড. প্রতিমা পাল-মজুমদার, ড. নওয়াজেশ আহমেদ (প্রয়াত), ডা. ইকবাল আমিনুল কবীর, প্রদীপ দাস, এডভোকেট একেএম নাসিম, এডভোকেট নির্মলেন্দু ধর (প্রয়াত), আশা অরনাল, সঞ্জয় কৈরী, স্বপন সাওতাল, অভিরত বাকতী, সুনীল বিশ্বাস, নাসিম আনোয়ার প্রমুখ। পরামর্শ, দিক নির্দেশনা, আতিথেয়তা, তথ্য এবং লেখা দিয়ে এরা সেড গবেষক দলকে কৃতার্থ করেছেন।

সেড-এর যারা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ এবং সম্পাদনায় অনেক শ্রম দিয়েছেন তারা হলেন রবিউল্লাহ, জেমস সুজিত মালো, খাদিজা খানম, আলিমুল হক, এফএমএ সালাম, শেখর কান্তি রায়, লুসিল সরকার, পার্থ শঙ্কর সাহা, মাহাবুবা মোস্তফা, দেবাশীষ মজুমদার, এএসএম সফরুল ইসলাম এবং নাইমুল হক। অক্ষর বিন্যাস ও পৃষ্ঠা সজ্জায় প্রসাদ সরকার এবং নানা দাপ্তরিক কাজে বাবুল বৈরাগী ও প্রসাদ সরকার নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং এর নেতা ও সদস্যদের কাছে কৃতজ্ঞ; তারা আমাদেরকে চা শ্রমিক ও তাদের উদ্বেগের বিষয়সমূহ বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টি বোর্ড ও তার দুটো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান—প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (পিডিইউ) এবং বাংলাদেশ টি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)—তথ্য, উপাত্ত, রিপোর্ট ও পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন।

এ বইয়ের জন্য প্রাথমিক গবেষণা ও প্রথম সংস্করণ প্রকাশের জন্য আমরা অস্ট্রেলীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। চা-শ্রমিক ও চা শিল্প সংশ্লিষ্ট জটিল বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজে নেদারল্যান্ড-ভিত্তিক ইকো কোঅপারেশন এবং জার্মানীর মিজেরিওর কাছেও আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সহায়তার জন্য আমরা মিজেরিওর ও ইকো কোঅপারেশনের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

চা শ্রমিকের কথা

আজকের বাংলাদেশে প্রথম চা উৎপাদন শুরু করেছিল ব্রিটিশ কোম্পানি। দীর্ঘ সময় ধরে চা ছিল মূলত রপ্তানিপণ্য। তবে এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের আজ যে চা উৎপন্ন হচ্ছে তার অধিকাংশ এখন আমরা নিজেরাই পান করছি।

চা, চা-এর উৎপাদন, দেশের অভ্যন্তরে চা-পানের দ্রুত বৃদ্ধি—এসব আলোচনায় যে শ্রমিক চা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদেরকে নিয়ে কমই কথা হয়। দেড়শো বছরেরও আগে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা-বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য এসব দরিদ্র ও হতভাগ্য মানুষকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল। যে জমিতে তারা চার-পাঁচ প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন তার উপর, এমনকি যে ঘরে তারা বাস করেন সে ঘরের উপরও তাদের কোনো মালিকানা নেই। তাদের দৈনিক মজুরি লজ্জাজনকভাবে কম এবং তাদের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে চা শ্রমিকের সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চা শ্রমিক হতে বাধ্য। তাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা নাজুক।

চা শ্রমিকের কথা গ্রন্থটি চা জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন শ্রেণির পাঠক, মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মীদের জন্য যারা চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝতে চান এবং চা শিল্প কীভাবে চলে তা জানতে আগ্রহী। এ গ্রন্থে যেসব তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণ, মতামত এবং পরামর্শ সন্নিবেশিত হয়েছে তার আর একটি উদ্দেশ্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য যারা চা জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতে কাজ করছেন তাদেরকে সচেতন করা।

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৫২-১৯-১

SEHD

মূল্য: ৪০০ টাকা US$15